Paper-III
Library Management

একক ১ ❐ বর্গীকরণ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ বর্গীকরণের উপযোগিতা
১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে বর্গীকরণ
১.৩ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বর্গীকরণ
১.৪ ধারণা বনাম শব্দ
১.৫ শ্রেণীসদস্যপদবাচ্যতা ও শ্রেণীভুক্তি
১.৬ শব্দার্থ ও সংজ্ঞা
১.৭ বর্গীকরণের নিয়ম : যুক্তিবিজ্ঞানের আলোকে
১.৭.১ যুক্তিগ্রথিত বিভাজন
১.৭.২ বিভাজনের নীতি
১.৮ যুক্তিগ্রথিত বিভাজনের সীমাবদ্ধতা
১.৯ পদের বিস্তৃতি এবং গভীরতা
১.১০ সারি ও শৃঙ্খল
১.১১ অনুশীলনী
১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

সদৃশ বস্তুর দলবদ্ধকরণের নাম শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণ। বিভিন্ন ভাব ও বস্তুকে সাদৃশ্যের তারতম্য অনুযায়ী দলবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকেই এক অর্থে বর্গীকরণ বলা হয়। একটি সর্বাত্মক বর্গে না পৌঁছনো পর্যন্ত চলে এই প্রক্রিয়ার অনিঃশেষ প্রবাহ। এই প্রক্রিয়ার নাম আরোহী বর্গীকরণ। বিভাজন কথাটির দ্বারা বুঝানো হয় ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়াটিকে। একটি শ্রেণীকে এখানে কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয় উপশ্রেণিতে। এই উপশ্রেণিকে আবার বিভক্ত করা চলে—এরকম বিভাজনের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশই অবতরণ করে যাওয়া সম্ভব। তাই এই পদ্ধতিকে বলা হয় অবরোহী বর্গীকরণ। কিন্তু একটা সময় আসে যখন বিভাজন করা হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় কিংবা অসম্ভব। সাধারণভাবে এই দুটি প্রক্রিয়াকেই বর্গীকরণ রূপে অভিহিত করা হয়। সেইজন্যই বর্গীকরণ যুগপৎ পৃথকীকরণের ও একত্রীকরণের এক প্রক্রিয়া। বর্গীকরণ সদৃশ বস্তুকে ঐক্যবদ্ধ করে আর বিসদৃশ বস্তুকে করে পৃথক।

যেসব বস্তুকে বর্গীকরণ হবে সেগুলি মূর্ত বা বিমূর্ত দুই-ই হতে পারে। কোনও চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ, সিংহ ও চিতাকে একই দলভুক্ত করতে পারি। কারণ তাদের মধ্যে বিড়ালত্ব নামক এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা হাতির মধ্যে নেই, মাকড়সার মধ্যেও নেই। বাস্তবে চিড়িয়াখানাটিকে যদি উড়িয়েই দেওয়া হয় তাহলে জ্যান্ত প্রাণীগুলিকে হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রটিকে অনুধাবন করতে কোনো বাধা নেই। বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই ধারণা স্বজ্ঞাজাত হতে পারে কিংবা হতে পারে সচেতন চিন্তাপ্রসূত।

বিচ্ছিন্নভাবেই হোক বা শ্রেণিবদ্ধভাবেই হোক বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিক সম্পর্ককেই বিশদ করে বর্গীকরণ। তৈলচিত্র ও রেখাচিত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটি জায়গায় সাদৃশ্য আছে এবং সে সাদৃশ্য ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনায় অনেক ঘনিষ্ঠ। কারণ তৈলচিত্র ও রেখাচিত্র দ্বিমাত্রিক। এইভাবেই দেখা যাবে যে তিন বস্তুই আত্মীয়—তিনটিই চারুশিল্পের অন্তর্গত। অবশ্য সংগীতশিল্প থেকে স্বতন্ত্র। বর্গীকরণের আশ্রয় নিলে এইভাবে সম্পর্কসূত্রের একটা বিচিত্র মায়াজাল যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, আমরা কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এই ধাঁচ ব্যবহার করি।

১.২ বর্গীকরণের উপযোগিতা

ধারণার অরণ্যে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্গীকরণের সাহায্যে আমরা সর্বপ্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্যেই পরিপাট্য এনে দিতে পারি। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ, কিন্তু এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে যে সংবেদনগুলি হুড়হুড়িয়ে ঢুকে পড়ে এবং মস্তিষ্কের ছাপ মারতে থাকে তাকে সামাল দেওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু বর্গীকরণের নীতি অনুযায়ী এই ধারণাগুলিকে ভাগ ভাগ করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপের পদতলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। ফলে চীৎকার ও হইহট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ এসে যাবে ঐকতানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য। অনুভূতি, দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ ও স্বাদের রাজ্যে তখন চলবে মহোৎসব। বর্গীকরণ আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়াকেও সরল করে। অধিক সংখ্যকের থেকে কমসংখ্যক নিয়ে নাড়াচাড়া করা তখন হয়ে যায় অনেক সহজ। আর তখনই আমরা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারি। তাই ডবলু. এস. জেভন্‌স বলেছেন, সাধারণ বস্তু ও ধারণা নিয়ে যত চিন্তাভাবনা তার সবের মধ্যেই রয়েছে বর্গীকরণ।

বিশেষ করে নিয়মবদ্ধ চিন্তনের ক্ষেত্রে বর্গীকরণ পদে পদে। সেখানে কথা বলতে গেলেই নির্ধারণ করতে হবে বাক্যের প্রকার, যুক্তিধারার প্রকার, বস্তুর শ্রেণী। জেভন্‌স তাই কিছুটা এগিয়েই বলেছেন যে, তর্কবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাকে বর্গীকরণ-তত্ত্ব বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। কোনোকিছুর সংজ্ঞা দিয়ে গেলেই তাকে স্মরণ করতে হয় তার নিকটতম বৃহত্তম বর্গটিকে, তারপর এই দুইয়ের পার্থক্য নির্ণয়। অর্থাৎ আগে বড়োদল, তারপর ছোটোদল, তারপর ছোটোদলের অন্তর্গত সকলের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যদ্যোতক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

যে-কোনো বিষয়ের পর্যালোচনাতেই বর্গীকরণই পথ দেখায়। অ্যারিস্টটল সেইভাবে এগিয়েছিলেন জ্ঞানের রাজ্যে। গবেষণামূলক কাজে বর্গীকরণের উপযোগিতা মানচিত্রের মতো। বর্গীকরণ হল জ্ঞানরাজ্যের মানচিত্র। সমাজজীবনেও কতরকমের শ্রেণি—অনন্তকাল এবং মহাবিশ্ব জুড়ে তা পরিব্যাপ্ত। বর্গীকরণ আছে, তাই মানবসমাজ হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ।

১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে বর্গীকরণ

প্রাত্যহিক জীবনেও বর্গীকরণ পদে পদে। হাটে-বাজারে গেলেও দেখা যাবে মাসের দোকান, মাছের দোকান, কাঁচা আনাজের দোকান। চৌদ্দ শাকের মতো সব মেশানো নয়, আলাদা আলাদা থরে থরে সাজানো। মনোহারী দোকানেও বর্গীকরণের নীতি অনুসৃত। এক জায়গায় হয়তো সাজানো বেবিফুডের পাহাড়, একটা তাকে হয়তো শুধুই শ্যাম্পু, অন্যটায় স্নো-ক্রীম, আরেকটায় যতরাজ্যের দাঁতের মাজন। কলকারখানায় গুদামে সর্বত্রই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে বর্গীকরণের সুবিন্যস্ত কারিগরি। বাদ্যযন্ত্রের দোকানে সাজানো যত সুরের সম্ভার, সিনেমা-

থিয়েটার হলগুলিতে ক্রমপর্যায়ে সন্নিবেশিত সব আসন। স্কুলেও শ্রেণি, বিভিন্ন বিভাগ। এরকম সর্বত্র। এবং লাইব্রেরিতেও—বইপত্র সব বর্গবন্ধ হয়ে ঘরে ঘরে আলমারিতে শেল্‌ফে সাজানো।

১.৩ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বর্গীকরণ (Natural and Artificial Classification)

বর্গীকরণ যুগপৎ পৃথকীকরণ ও একত্রীকরণের এক প্রক্রিয়া। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণায়ক ভাব ও গুণের উপর নির্ভর করে যখন বস্তু বা ব্যক্তিকে দলবন্ধ বা পৃথক করা হয় তখন তাকে বলে বিভাজনের ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য (Characteristic)। মৌল সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের তারতম্য অনুসারে যখন ব্যক্তি বা বস্তুকে দলবন্ধ বা পৃথক করা যায় তখন তাকে বলে স্বাভাবিক বর্গীকরণ। বহিরঙ্গ বা আকস্মিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যখন ব্যক্তি বা বস্তুকে দলবন্ধ না বা পৃথক করে তখন তাকে বলে কৃত্রিম বর্গীকরণ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কৃত্রিম ও স্বাভাবিক বর্গীকরণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে মানুষ সর্বাধিক মৌল বর্গীকরণেরই আশ্রয় নেয়। শ্রেণীসদস্যদের মধ্যে যেখানে সর্বাধিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সংস্থান ঘটে সেখানে সেই শ্রেণি বা বর্গকেই বৈজ্ঞানিকরা বরেণ্য বলে গণ্য করেন। প্রাণীবিজ্ঞানী গঠনগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের ভাগ করতে পারেন। এ হিসেবে তিনি, ঘোড়া, গোরু, খরগোশ, ইঁদুর সব একাকার হয়ে যাবে এক শ্রেণীর মধ্যে। এরা সকলেই স্তন্যপায়ী। একজন সাধারণ মানুষ তিমিকে ফেলতে চাইবে মৎস্যবর্গে। কারণ উভয়েই জলচর। কিন্তু সাদৃশ্য শুধু ওই এক জায়গাতেই। প্রথম ধাঁচের শ্রেণিবিভাগ হল স্বাভাবিক, দ্বিতীয়টি কৃত্রিম। বিজ্ঞানী যতটা বেশি জানা সম্ভব সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন। ফলে এই প্রভেদ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যের কাছে এই প্রভেদের গুরুত্ব অতটা নেই। কৃষক খাদ্য উৎপাদনেই সচেষ্ট, জ্ঞানোৎপাদনে নয়। সে প্রাণীদের বিভাগ করতে গিয়ে গোরু ঘোড়াকেই ফেলবে উপকারী বর্গে, খরগোশ ও ইঁদুর তার দৃষ্টিতে উৎপাত বলে গণ্য হবে। প্রাণীবিজ্ঞানীর স্তন্যপায়ীতার মানদণ্ড তার মনে কোনো আগ্রহই সৃষ্টি করতে পারবে না। তিমিকে সে আদৌ প্রাণী বলেই মনে করবে না। কারণ তিমিদের সে তার গোরুপালের সঙ্গেও দেখেনি, কিংবা মাঠের শস্যক্ষেত্রেও দেখেনি। ওদিকে মৎস্যশিল্প তিমিকে আত্মীয়বৎ গণ্য করবে। কারণ মৎস্য নিয়ে তাদের যে প্রক্রিয়া, তিমিকে নিয়েও তাই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে মৎস্য ও তিমিকে তারা পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করে।

১.৪ ধারণা বনাম শব্দ

বর্গীকরণের আলোচনায় ধারণা এবং শব্দের মৌলিক পার্থক্য স্বীকৃত। যদিও ধারণাগুলি শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় কিন্তু ধারণা এবং শব্দ সমার্থক নয়। যেমন, একজন ইংরেজ যেখানে ঘোড়া বুঝাতে হর্স শব্দটিকে উচ্চারণ করবেন, একজন ফরাসী 'সেভাল' শব্দটি ব্যবহার করবেন, একজন জার্মান 'ফার্ট' শব্দটি বলবেন, সেখানে একজন বাঙালী বলতে পারেন 'অশ্ব' কিংবা ঘোড়া। এখানে ধারণা একই, কিন্তু শব্দ ভিন্ন। আবার এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যা প্রকাশ করার মতো শব্দ আমাদের জানা নেই, অর্থাৎ যা অনির্বচনীয়। অধিকাংশ ধারণাই হল শ্রেণিসম্পর্কত। অর্থাৎ এই ধারণাগুলি বস্তুসমূহের। মনে রাখতে হবে, লাইব্রেরির বর্গীকরণে ধারণায় মূল্যই স্বীকৃত, বস্তুর নয়।

শ্রেণী-সম্বন্ধীয় ধারণা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিনা এটা বলার সামর্থ্য ; কিংবা শ্রেণীভুক্ত নয় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বর্ণন সামর্থ্য। 'হর্স' শব্দটি অর্থ জানলেই এই ধারণাটি মনের মধ্যে দাগ কাটতে পারে।

এইপাল গোরু, ভেড়া, ছাগল ও গাধার মধ্য থেকে অশ্বকে বেছে নিতে পারলেই বুঝানো হল প্রথমোক্ত সামর্থ্যটি। কিন্তু যদি বলা হয়, অশ্ব হল খুরওয়ালা এক জন্তু বিশেষ। তাহলে দেখানো হল বৈশিষ্ট্যের বর্ণন সামর্থ্যটি।

১.৫ শ্রেণি সদস্যপদবাচ্যতা ও শ্রেণিভুক্তি (Class Membership and Class Inclusion)

শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার দুটি দিক ; শ্রেণিসদস্যপদবাচ্যতা ও শ্রেণীভুক্তি শ্রেণীর মধ্যে বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের পৃথক পৃথক বস্তু বা ব্যক্তি হল শ্রেণীর সদস্য। শ্রেণীভুক্তি বলতে বোঝায় বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর শ্রেণিকে। যেমন মানুষ শ্রেণির হলেন রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি, আর মানুষ শ্রেণীর উপশ্রেণীগুলি ধনী, দরিদ্র, ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সচেতনতারই প্রাধান্য, কিন্তু সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বীকৃতিই মুখ্য। সেখানে লেখক ও তাঁর রচনাবলী, ক্ষেত্রে তাই শ্রেণীসদস্যপদবাচ্যতা ও শ্রেণিভুক্তি তুল্যমূল্য।

১.৬ শব্দার্থ ও সংজ্ঞা

শব্দার্থ ও সংজ্ঞার সঙ্গে বর্গীকরণের যোগ ঘনিষ্ঠ। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক। মনোবিজ্ঞানীর কারবার মানুষের মনকে নিয়ে। অতএব এই মনে বর্গীকরণ প্রক্রিয়ার ক্রিয়াকলাপই হল মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। শিশুর মনে বর্গীকরণ সামর্থ্যের বিকাশ কীভাবে হয়, চিন্তাশীল ও বিদ্বান মানুষের মনে এ কী ভূমিকা গ্রহণ করে—এসবই হল মনোবিজ্ঞানীর আলোচনার বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদকে শব্দার্থ, সংজ্ঞা এবং ভাষাবিশেষের আভ্যন্তরীণ বর্গীকরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এসবই হল মানুষের আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও সাধারণীকরণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা। আর এইসব কার্যাবলীর স্বরূপ, প্রকৃতি নির্ণয় ও এইসব শব্দাবলীর সুনির্দিষ্ট অর্থ নিরূপণ করেন দার্শনিক।

১.৭ বর্গীকরণের নিয়ম : যুক্তিবিজ্ঞানের আলোকে

জীবনে যখনই কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সমাধান করা আমাদের মনোধর্ম। এই সমাধান করার মানস প্রক্রিয়ার নাম হল চিন্তা। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির এই চিন্তাকে সুসংহত করার পথনির্দেশ করে যুক্তি বা তর্ক বিজ্ঞান। যে সকল সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করলে চিন্তা নির্ভুল হয় এবং সত্যলাভ ঘটে, সেগুলি যে বিজ্ঞানে নির্ণীত হয় তা হল যুক্তিবিজ্ঞান। দর্শনশাস্ত্রের শাখা হিসাবেই তার স্বীকৃতি। কিন্তু যে শাস্ত্রেই নানাবিধ সাক্ষ্য পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা থাকে সেখানেই হাত বাড়িয়ে দিতে হয় যুক্তিবিজ্ঞানের দিকে।

যুক্তিবিজ্ঞানে বিশ্লেষণের একককে বলে বচন। অর্থাৎ বাক্যসংবন্ধ কোনো কথা। বচনে থাকে দুটি পদের সমষ্টি এবং এই দুটি পদের (উদ্দেশ্য ও বিধেয়) সম্বন্ধটুকু নির্দেশ করে দেওয়াই বচনের কাজ। বচনে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকে। এ ছাড়া থাকে সংযোজক যেটা উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে যুক্ত করে। যেমন 'ফুলটি হয় সুন্দর'। এখানে 'ফুল' উদ্দেশ্য, আর 'সুন্দর' বিধেয়। 'হয়' হল সংযোজক। যুক্তিবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের পদের মধ্যে ভেদ রেখাটি খুঁজে বের করতে হয়। ফলে বর্গীকরণের মূল নিয়মগুলি যুক্তিবিজ্ঞানে লভ্য।

১.৭.১ যুক্তি-গ্রথিত বিভাজন

বর্গীকরণে এবং বিভাজনে একই রকম চিন্তাপদ্ধতি অনুসৃত। বিভাজন হল বর্গকে উপবর্গে ভাগ করা। বর্গীকরণ হল বস্তুসমূহকে বর্গে ভাগ করা। গ্রন্থাগারে বর্গীকরণে মোটামুটি তর্কবিজ্ঞানের বর্গীকরণ ও বিভাজনের দুইয়েরই নিয়মগুলি অনুসৃত হয়। বিভাজনে কোনোও একটি জাতিকে তার অধীনস্থ উপজাতিসমূহে ভাগ করতে পারি। যেমন, মনুষ্যজাদিকে যখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি উপজাতিতে ভাগ করি তখন ধর্মকেই বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি। যে গুণ বা গুণসমষ্টির প্রতি লক্ষ রেখে একটি জাতিকে তার উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা হয়, তাকে বিভাজনের ভিত্তি বলা হয়। এই উপজাতিগুলির প্রত্যেকটি আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর উপজাতিসমূহে ভাগ করা যেতে পারে। এইভাবে পরমতম জাতি (Summum genus) থেকে শুরু করে প্রত্যেক জাতিকে ভাগ করতে থাকলে এমন কতকগুলি উপজাতি আমরা পাব যাদের আর কোনো উপজাতিতে ভাগ করা যাবে না। যখন এরকম একটা অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছবো তখনই পরমতম জাতিটির বিভাজন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে—একথা বলা যেতে পারে।

১.৭.২ বিভাজনের নীতি

বিভাজনে কমপক্ষে দুটি বর্গ থাকবেই। যেমন, সাধারণভাবে ব্যক্তিসমূহের লিঙ্গাভিত্তিক বিভাজনে পুরুষ ও নারী এই দুটি বর্গ সৃষ্টি হবেই। কিন্তু যদি বলা হয় মাতৃজাতি—তাহলে এই নীতি খাটবে না। কারণ মাতৃজাতির সকলেই নারী জাতীয়।

পৃথক পৃথক বর্গ তৈরির সময় একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে একটিই বিভাজন নীতির আশ্রয় নেওয়া উচিত। যেমন, ধর্ম হিসাবে মানুষকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ভাগ করতে পারি। আবার বর্গ হিসাবে আমরা মানুষকে কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায় প্রভৃতি বর্গে ভাগ করতে পারি। যদি আমরা মানুষকে শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়, হিন্দু, মুসলমান—এই চারটি বর্গে ভাগ করি, তবে একই সময়ে আমরা দুটি বিভাজনভিত্তিকে আশ্রয় করছি। এর ফলে বর্গগুলির সীমারেখা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট থেকে যায়। একই মানুষ একই সময়ে কৃষ্ণকায় এবং হিন্দু হতে পারে। ফলে বর্গগুলি পরস্পর বিভিন্ন হয় না। এই দোষকে বলা হয় সঙ্কর বর্গীকরণ। এ ধরনের বহুভিত্তিক বর্গীকরণ অভিপ্রেত নয়। উপবর্গগুলি তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, উপবর্গগুলির সীমারেখা যেন সুনির্দিষ্ট থাকে। উপবর্গগুলি যেন পরস্পর বিভিন্ন হয় ; একই ব্যক্তি বা বস্তু যেন দুটি উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত না হয়। গোরুকে যদি আমরা সাদা কালো, দুগ্ধবতী, হৃষ্টপুষ্ট প্রভৃতি উপবর্গে ভাগ করি তখন উপবর্গগুলি পরস্পর বিভিন্ন হবে না। কারণ, একই গোরু সাদা, দুগ্ধবতী এবং হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে। এই ধরনের বিভাজনও সঙ্কর বর্গীকরণ সৃষ্টি করে।

একই বর্গকে ক্রমান্বয়ে ছোটো থেকে আরও ছোটো উপবিভাগে ভাগ করার সময় কোনোও ধাপকেই ডিঙ্গিয়ে যাওয়া চলবে না। মানুষকে আমরা প্রথমে এশিয়াবাসী, ইউরোপবাসী প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করে তারপরে এশিয়াবাসীদের আবার ভারতীয়, চিনা, জাপানী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করি এবং সর্বশেষে ভারতীয়দের আবার বাঙালি, অসমীয়া, উড়িয়া, মাদ্রাজী প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করি তখন বিভাজন কর্মটি সুষ্ঠু এবং ক্রমিক হবে। আমরা যখন মানুষকে শিক্ষিত ভারতীয়, অশিক্ষিত ভারতীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করি তখনই এই দোষ ঘটে। এখানে বিভাজন কর্মটি অক্রমিক বা ক্রমরহিত হওয়ার দোষ ঘটেছে।

১.৮ যুক্তিগ্রথিত বিভাজনের সীমাবদ্ধতা

গ্রন্থাগারের কাজে যুক্তি-গ্রথিত বিভাজন-নীতি প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা স্বীকৃত। পুরোপুরি পৃথকভাবের স্বতন্ত্র বর্গসৃষ্টিরই আদর্শ। এটি সম্ভব হয় বিজ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞার প্রসাদে। বিজ্ঞানই যথাযথ সংজ্ঞা আমাদের উপহার দিতে পারে। সাধারণত ভাষার অর্থগত দিকটি অত্যন্ত অস্থির—সেখানে অবিরতই পরিবর্তনের লীলা। অধিকাংশ বিষয়েই পুরোপুরি পৃথকভাবের স্বতন্ত্র বর্গসৃষ্টি সহজ কর্ম নয়।

উপবর্গ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কোন্‌টি যে বাদ গেল না এমন কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। যে উপবর্গগুলির অস্তিত্ব আছে এবং যেগুলি ভাবীকালের গর্ভে নিহিত—উভয় ক্ষেত্রেই ঘোর অনিশ্চয়তা। একটা বর্গকে তার সবগুলি উপবর্গ সমেত চিহ্নিত করার জন্য যেসব ধাপের অবলম্বন আবশ্যক সে সম্পর্কেও কোনো চূড়ান্ত নির্দেশ নেই। যুক্তিবিজ্ঞানের বিভাজন ব্যাপারটি শুধুমাত্র নির্দেশ করে একপ্রকারের সম্পর্ককে। এখানে বস্তু এবং তার প্রকার বলতেই সব শেষ। যুক্তিবিজ্ঞানে একেই বলে জাতি-উপজাতি সম্পর্ক। কিন্তু গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের আরও অনেক সম্পর্কের কথা পরে আমরা জানতে পারব।

অনেক সময় যুক্তিবিজ্ঞানের বিভাজনের সঙ্গো বিভাগ অর্থাৎ সমগ্র অংশের সম্পর্ক একাকার হয়ে গিয়ে বিভ্রান্তি ঘটায়। যেমন, দেশকে যদি আবহাওয়ার দিক থেকে গরম ও ঠান্ডা হিসেবে ভাগ করতে যাই তাহলে, উদ্ভব হল যুক্তিবিজ্ঞানের জাতি উপজাতি সম্পর্ক নির্দেশক বিভাজনের। কিন্তু ভারতবর্ষকে যদি প্রদেশভিত্তিক গঠনের দিক থেকে দেখি, তবে এসে যাবে সমগ্র ও অংশের সম্পর্ক। গরমদেশ নিশ্চয়ই দেশেরই একপ্রকার ভেদ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গা ভারতের কোনোপ্রকার ভেদ নয়—একটা অংশ মাত্র।

১.৯ পদের বিস্তৃতি (Extension) এবং গভীরতা (Intension)

কোনো পদের দ্বারা দ্যোতিত সমুদয় দ্রব্যের সমষ্টি হল ওই পদের বিস্তৃতি। বাচ্যার্থ পদ নির্দিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি অথবা বস্তুকে বোঝায়। অর্থাৎ পদের বাচ্যার্থ বলতে ওই পদ যে বস্তু স্বভাবের বাচক, তাদের বুঝতে হবে। যেমন, 'মানুষ' বলতে সমস্ত 'মানুষ' নামধারী জীবকে বুঝায়। মানুষ পদের এটাই হল বাচ্যার্থ। ঠিক এইভাবেই গভীরতা হল গুণধর্মের সমষ্টি, কিংবা ওই পদটির সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য যে ন্যূনতম গুণধর্মের প্রয়োজন হয় তাই হল তার গভীরতা। দ্যোতনা (connotation) বলতে আমরা পদের লক্ষণ বা গুণগত স্বভাবকে বুঝি। 'মানুষ' পদের দ্যোতনা হল তার জীবত্ব এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্নতা। সব পদকেই দুটি পৃথকভাবে বিচার করা চলে। বিস্তৃতিতে উদ্ভাসিত হয় শ্রেণীনাম—এখানে দেখা যাবে ওই নামের আওতায় কোনো কোনো দ্রব্য এসে পড়ে। গভীরতা বলতে বিভিন্ন গুণ ধর্ম যা ওই বস্তুতে সংস্থিত। গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে পদের 'বিস্তৃতি' ও 'বাচ্যার্থ' কথা দুটি সমার্থক, পদের 'গভীরতা ও দ্যোতনা' কথা দুটির অর্থও এক।

১.১০ সারি ও শৃঙ্খল (Array and Chain)

নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে বিষয় বিভাজন করলে পাওয়া যায় একাধিক সমপদস্থ বিভাগের এক সারি। প্রত্যেকটি বিভাগ আবার অনেকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত হতে পারে। সেখানেও উদ্ভব হবে সমপদস্থ বিভাগের সারিবদ্ধ রূপ। সঙ্গো সঙ্গো মূল বিষয়ের সঙ্গো প্রত্যেক সমপদস্থ বিভাগের সংযোগ সূত্রের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

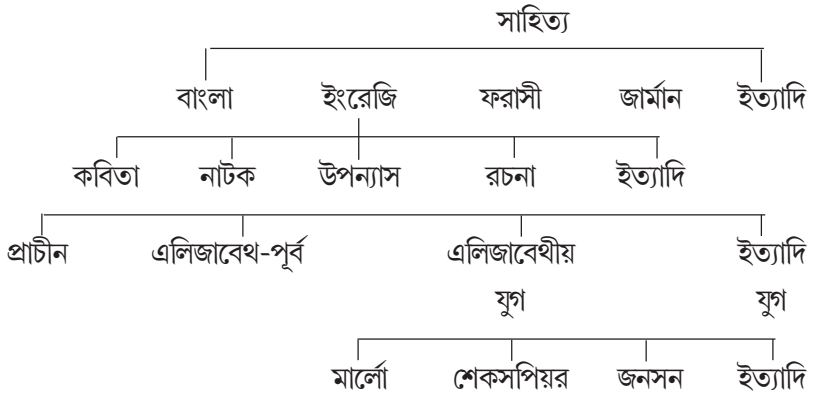

সমপদস্থ বিভাগের যে চারটি পর্যায় নির্দেশিত হল তার প্রত্যেকটিই পূর্ববর্তীর অধীন। যদি শেকসপিয়র থেকে উল্লম্ব পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয় তাহলে আমরা পথপ্রান্তে পেয়ে যাব মূল বিষয়টি অর্থাৎ সাহিত্যের সাক্ষাত। আর তখনই সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে শেকসপিয়রের ক্রশ-বিভাজন সম্পর্কটি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গ্রন্থ বর্গীকরণে বিভাজন ব্যাপারটি হল দ্বি-মাত্রিক। যখন সমপদস্থ বিষয়ের সারিবদ্ধ বিভাজন চিত্রটি অঙ্কিত হবে তখনই রচিত হবে সংসখ্যক অধীনস্থ উপবিভাগের পরম্পরা বা শৃঙ্খল।

১.১১ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বর্গীকরণের পার্থক্য কী ?

২। ধারণা ও শব্দের মৌলিক পার্থক্য কী ?

৩। বিভাজনের নীতিগুলি আলোচনা করুন।

৪। যুক্তিগ্রথিত বিভাজনের সীমাবদ্ধতা কোথায় ?

৫। সারি বলতে কী বোঝেন ?—উদাহরণ দিন।

১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Chakrabarti, B. : Library classification theory. Calcutta, World Press, 1994

২. Language, D. W. : Classification: its kinds, elements, systems and applications. Bowker Sour, 1992

৩. Ranganathan, S. R. : Elements of library classification, 3rd ed. London, Asia Publishing, 1962